ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে আজ এই একবিংশ শতকের শুরুর লগ্নে দাঁড়িয়েও দেখতে পাওয়া যায় নারীদের সৃষ্টির পাশে তাদের স্বীকৃতির স্থান কীভাবে অন্তরালে চলে যায় পিতৃতন্ত্রের সুদক্ষ আধিপত্যের আগ্রাসনে। এখন চারপাশে কতো নারী তার শৈল্পিক, বৌদ্ধিক, মননজাত সৃষ্টির আলোকে বিস্তৃত, বিকশিত নতুন নতুন আলোকবর্তিকা হাতে। অথচ, স্মরণসভায়, সম্মাননা সভায় তারা অদ্ভুতভাবে হারিয়ে যায় পুরুষের উচ্চস্বরের ভিড়ে। কাব্যজগতে নারীদের কবিতা বৈচিত্র্যময় এবং আন্তরিক নির্যাস থেকে জাত হলেও পুরুষকেই সভামুখ্য করা হয়, মঞ্চের ভিতপ্রস্তরে তার মূল্য অধিক। কজন পাঠকই বা চেনে সেই সকল নারীদের মুখ যাঁরা লিখে চলেছেন শত প্রাপ্তিহীনতার ভিতর দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সৃষ্টির ইচ্ছে থেকে, কবিতা লেখার অদম্য স্পৃহা থেকে। এমনকি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা জুড়েছে যে নারীর সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে তিনিও নিজের সাক্ষাৎকারে প্রিয় কবির নাম লিখতে গিয়ে ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেন না কোনো নারীর নাম। অপরদিকে পুরুষ তার সাহিত্যজগতকে কেন্দ্র করে গবেষণাধর্মী নব্বই শতাংশ গ্রন্থে নারীকে জায়গা দিতে চায়নি, চায় না পুরুষ আজও। কতো বিখ্যাত কবি তাঁর অমূল্য বক্তব্যে এই একবিংশের স্রষ্টার ভিড়ে দাঁড়িয়েও সদর্ভে উচ্চারণ করেন— 'মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না'। এই যন্ত্রণার জন্ম আজ নয়, সেই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী থেকে এর শুরু, যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কপ্রবাহে পরাস্ত করার পরেই যাকে ধমক খেতে হয় নারী হয়ে এত স্পর্ধা দেখানোর অপরাধে। প্রাচীনকালের সৃষ্টিতে নারীর নাম অজানা নয় কিন্তু স্মরণের প্রয়োজন পড়ে না তাদের কথা এই সমাজে। তারা যেন আজ শুধুই নাম। ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্যবহনকারী মাত্র। মধ্যযুগের সাহিত্য-ইতিহাসে যে মেয়েটি ছড়া লিখেছিল, তার নাম কে জানে? রামীর পদাবলীর কাব্যের সংরক্ষণ কই? আমরা কতো কষ্টে খুঁজে পেয়েছি মাধবীদাসীর নাম। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ আমরা মেয়েরা নিজেরাই খুঁজে পড়তে চাইনি কখনো। দেখতে চাইনি একজন বিদূষী নারীর হাতে রামায়ণ কতটা পিতৃতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারলো। কারণ, বাল্মীকি, ভবভূতির শ্রেষ্ঠত্বের কাছে চন্দ্রাবতীর স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়নি কোনোদিন। এভাবেই চাপা পড়ে যায় নারীদের সৃষ্টি, চাপা পড়ে যায় স্রষ্টা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কাল বলতেই আমরা বুঝি ব্রিটিশপর্বকাল। আমরা বুঝি

বাংলা সাহিত্যে-সমাজে-কাব্যে এক রদবদলের কালপর্যায়। এই সময়কালটি অন্তত ভারতীয় নারীদের কাছে ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায়। বিশেষত উনিশ শতকের শুরুর পালে নবজাগরণের হাওয়া নারীকেন্দ্রিক সমাজ সংস্কারে যে আলোড়ন তুলেছিল সেই পথ ধরেই প্রথম মুদ্রিত সৃষ্টির স্বপ্নকে ছুঁতে পেরেছিল নারীরা। সেই স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছতে বহু 'জো হুজুর'গিরি করতে হয়েছে নারীদের। বহু আপোষের ভিড়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ নিজের কথা বলতে পেরেছে নারীরা। সমাজের কথামতো ঠিকঠিক পথ ধরে কবিতা লিখতে লিখতে তবুও যেন কখন হঠাৎ মেয়েরা সরে গেছে শাস্ত্রের চোখরাঙানি থেকে। বলে ফেলেছে রাগের কথা, দুঃখের কথা, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির কথা। সাহিত্যক্ষেত্রে সেই স্পর্ধাগুলোও অদেখা থেকে গেছে। মেয়েরা অক্ষরের সুবাস নিতে নিতে তখনো ভেবেছে এই সমাজ নিশ্চয়ই তাদের সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেবে। কিন্তু সমাজ তাদের সংখ্যামাত্র করে রেখে দিয়েছে। গীতিকবি হিসেবে পরিচিত তারা। কাব্যসমাজে তাদের পরিচয়, তাদের কাব্যসুর বৈচিত্র্যহীন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা এই তকমাগুলি বারবার উচ্চারিত হতে হতে পাঠকেরও আর ইচ্ছে জন্মায়নি নারীদের কবিতা খুলে দেখার। নারীদের স্রষ্টা হিসেবে কবিতা যাপনের পথ সহজ ছিল না কোনোদিন। অক্ষর অধিকারের যুদ্ধে জিততে না জিততেই নারী শরণাপন্ন হয়েছিল কবিতার কাছে। নারী চেয়েছিল কবিতার দেহের ভিতর দিয়েই নিজেদের সৃষ্টিসত্তার বিকাশসাধন করতে। এই পথে চলতে গিয়ে তাদের ভাবনার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। ঘর-সংসার-পিতা-স্বামী-পুত্রের ভাগ্যে ভাগ্যান্বেষী পরনির্ভরশীলতা নারীর কল্পনাকেও করে রেখেছিল পরাধীন। কল্পনার বিকাশের মতো পরিসর গ্রহণ করার মানসিক সক্ষমতা তারা নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছিল প্রজন্মের পর প্রজন্মবাহিত প্রতিবাদহীন, প্রতিরোধহীন, লজ্জা, ভয় এবং সংকোচপূর্ণ জীবনযাপনের সূত্রে। নিজের দিকে তাকানো দূরে থাক নিজেকে আলাদাভাবে মানুষ হিসেবে চিহ্নিতকরণের চিন্তাও আসতে বাধা পেত স্রষ্টার হৃদয়গহনে। তবুও কবিতা জন্মেছে। শিক্ষার স্বমহিমায় নারী প্রশ্ন করতে শুরু করেছে সমাজকে। নারী তাকিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আচারের নামে নির্মমতার দিকে। হয়তো কান্নার রং পেয়েছে কবিতা, পেয়েছে সমবেদনার রং, কবিতা নারীর হাতে এসে হয়ে উঠেছে পরিহাসময় হাহাকার এই সমাজের প্রতি। কিন্তু এই প্রতিটি রং ও হাহাকার সূচনা ঘটিয়েছে বিদ্রোহের। উনিশ শতকের হাত ধরেই প্রথমবার নারীদের কাব্যের ভিতর থেকে প্রশ্ন করার মতো সাহস জন্মেছে যা সমাজকে ভয় দেখিয়েছে। তাই হারিয়ে গেছে নারীদের রচিত

অজস্র কবিতা। হারিয়ে গেছে নারীদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার স্তরান্তরগুলি। সেইসব কবি ও কবিতা সমাজের কাছে, পিতৃতান্ত্রিক মূলস্রোত আশ্রিত সাহিত্যের কাছে নিছক 'মহিলা কবি'র কবিতা-প্রচেষ্টা রূপে ধামাচাপা পড়ে গেছে। কতো বই, কতো কবিতা কবিরা নিজেই পারেনি সংগ্রহ করে রাখতে। সংসারের দায়ে শুধু নয়, নারীর রচনা হিসেবে নারীরই তুচ্ছতা জ্ঞানে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ের দুই কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায়। কবি মানকুমারী বসুর কবিতায় সমর্পণের স্বর, আপোষের স্বর, চিরাচরিত নারীধর্ম হিসেবে স্বীকৃত যাপনের স্বর যত বেশি বেজে উঠেছে, ততই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে বাহবা পেয়েছেন তিনি। এই খ্যাতির বিশেষণে যুক্ত হয়েছে 'সতীসাধ্বী', 'ঘরোয়া', 'বাঙালি নারীর স্বর' প্রভৃতি শব্দবন্ধনীগুলি। কিন্তু যখন কবি নারীর যন্ত্রণার কথা বলেছেন, সংসার ঘিরে নারীর সঙ্গে ঘটে চলা বহুবিধ অন্যায়ের কথা বলেছেন— সমাজ সেইসব কবিতা দেখেও দেখেনি। কবি মানকুমারী প্রিয়তমহীন জীবনের শূন্যতার কষ্টে বারবার দেহজ সুখের কথা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি সাহায্য নিয়েছেন রূপকের। তাই তাঁর কবিতা ছায়াময়। কবি নিজের দিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে নিজের আয়না দিয়েই সমাজকে এঁকেছেন, যে সমাজে নারীর অবমাননা, পতিতার প্রতি নির্মমতা, পতিতা হিসেবে নারীকে ঠেলে ফেলে ভদ্রতার পোশাক পরে থাকা এই সমাজের ছলচাতুরী ধরা পড়েছে কবির কবিতায়। তাই কবিতাগুলি কখনোই জনসমক্ষে পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। মানকুমারীর কবিতায় সমাজের প্রতি এই সমর্পণী সুর পেরিয়ে বিদ্রোহের স্বর নাকি দুই স্বরালাপই একই সাথে জীবনের উত্থান-পতনের মতো জড়িয়ে, তাকে খুঁজে বের করা দরকার। কবি কামিনী রায়ের ব্যক্তিগত জীবন অন্তত বিবাহের আগে অবধি বৈচিত্র্যময় এবং সেই সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে সাহসী, প্রথাবিরুদ্ধ এক জীবন। উচ্চশিক্ষিত, চাকুরিরতা নারী উনিশ ও বিশদশকের শুরুতে প্রায় বিরল। সেই নারীর প্রথম প্রকাশ যে কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে ঘটে, সেখানে শুধু বিষাদ নয়, প্রেমও জড়িয়ে অসীম। একজন কুমারী নারী রক্ষণশীল সমাজে বসে লিখছেন প্রেমের কবিতা, স্বভাবতই আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, কী পরিমাণ অপমানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়তে হয়েছিল সেই কাব্যগ্রন্থকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে গিলটি ও সোনার পার্থক্য বুঝতেন কবি। তাই, পত্রিকা দপ্তরে নিজের কবিতা পুরুষের ছদ্মনামে পাঠিয়ে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন কবিতার মানকে। সেইসময় নারীশিক্ষা আন্দোলনের সুপ্রভাবের একটি

নেতিবাচক দিকও ছিল। নারীদের দ্বারা রচিত বলেই যেকোনো সৃষ্টিকে পত্রিকায় স্থান দিতে চাইতেন সমাজসংস্কারক-সম্পাদকেরা। ফলে নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করার সুযোগ ঘটেনি বেশিরভাগ নারীরই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যথেষ্ট মেধা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের মেলবন্ধনে তৈরি ছিলেন কবি কামিনী রায়। এই মননের ছাপ তাঁর কবিতাগুলির ভিতরেও ধরা পড়ে। তাই তিনি যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা উচ্চারণ করেন কবিতার ভিতর, তখন সত্যি অর্থে 'নবজাগরণ' শব্দটির মূল্য বোঝা যায়। কবির কবিতায় শুভ চেতনা, সম্মিলিত চেতনা, স্বদেশপ্রীতি যেমন উঠে এসেছে, তেমনই উঠে এসেছে সমাজের তৈরি অরাজকতার প্রতি ক্ষোভ, বিদ্বেষ। কবি ব্যঙ্গের স্বরে বারবার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছেন সমাজে প্রচলিত মুখ ও মুখোশের। একই সমাজের বাসিন্দা হয়েও নারী ও পুরুষের প্রতি ব্যবহারে, সুযোগ-সুবিধায়, আদর-আপ্যায়নে এত বিভেদ, কবির চোখ এড়ায়নি। সেই স্বর যখন উঠে এসেছে কবিতায়, কবিতা গ্রহণযোগ্য হয়নি পাঠকের কাছে, কারণ আপামর পাঠকের অধিকাংশই পুরুষ। এভাবেই বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গেছে কবিতা আশ্রিত আগুনের স্রোতগুলি। কামিনী রায়ের কবিতায় সমর্পণের সুর বেজেছে, কিন্তু সেই সুরের ভিতর নারীর দাসীপ্রবৃত্তির যে ধীরে ধীরে অবসান ঘটছে তার দলিলও ধরা পড়ে। কবির কবিতাগুলি না পড়লে এই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলি যেমন বোঝা সম্ভব নয়, তেমনই বোঝা যাবে না স্রষ্টা হিসেবে নারীর কাব্যজগতে করে চলা অক্ষরের সাহচর্যে অসম যুদ্ধগুলি। ধরা পড়বে না নারীর জিতে যাওয়াগুলি, যেখানে কোনো আলো নেই, অন্ধকুঠুরি, মুখ বন্ধ। নেই আলোচনা। সেখানেই কেমন একের পর এক জট ছাড়িয়ে উঠে আসছে নারী কবিতার হাত ধরে, ধরা পড়বে না ততক্ষন, যতক্ষণ নিরীক্ষা হবে না সেই অন্দরের মহলে।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গন্ধ বয়ে নিয়ে এল চল্লিশের দশক। এতদিনের কবিতার যে আঙ্গিককে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল একান্তভাবেই নারীদের কবিতার ধরন বলে, সেই ধরন গেল বদলে। এই চমকের জন্য প্রস্তুত ছিল না বাংলা সাহিত্য। প্রস্তুত ছিল না সমাজ-গৃহীত পিতৃতন্ত্র। কবি রাজলক্ষ্মী দেবী প্রথম যেন নারীর অন্তরগহনের কথা বলে উঠলেন। স্বামী-সংসার-সন্তান ছেড়ে নারীর নিজের প্রেম যন্ত্রণা ভালোবাসার অসাধারণ ছবি তিনি এঁকে দেখালেন শব্দের সৌজন্যে। সেইসকল কবিতায় ধরা পড়লো ভাষা, শব্দ, ভাবনার এমন অভিনবত্ব যা পিতৃতন্ত্রের কাছে সমর্পণের চেহারার প্রকাশ ও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে পালটে। পঞ্চাশের দশক যেন ঝড়ের দশক। মূলস্রোতের পুরুষ কবিদের কবিতাময় আন্দোলন,

সব পুরনো শৈল্পিক ঐতিহ্য, শৈল্পিক চেতনাকে ভেঙেচুরে নতুন ভাবে গড়ে তোলার জন্য উন্মত্ত বিক্ষিপ্ত টগবগে এক জোয়ার সাধিত হচ্ছিলো সেই দশকে। পুরুষের কবিতায় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে নারীদেরকে ঘিরে একপ্রকার প্রেয়সী আর কল্যাণময়ী রূপের ফ্যান্টাসি ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতায় নারী হয়ে উঠলো অস্থি-মজ্জা ও মাংসের পুঁটুলি। যৌনতা দিয়ে কবিতাকে বারবার স্পর্ধাময় করে তুলতে চেয়ে নারীদেহকে যৌনউদ্দীপক রূপে প্রতিপন্ন করাই হয়ে উঠলো মূলস্রোতের কবিদের সাহসিকতার পরিচয়। এমনই এক সমাজের ভেতর থেকে জন্ম নিল এক রাগী যুবতী যিনি বাংলা সাহিত্যের কাব্যিক ইতিহাসে অন্য আঘাত রূপে পরিচিতি রেখে গেলেন নিজের। আত্মবিশ্বাসী এই কবি প্রতিমুহূর্তে চিনিয়ে দিতে শুরু করলেন এমন এক সমাজকে যেখানে শিক্ষিত স্বনির্ভর প্রজ্ঞাময়ীর পাশে আদতে কেউ নেই। প্রতিটি সহানুভূতি, সমানুভূতি সম্মান, সমপ্রতিষ্ঠা অর্জনের দরজা সমস্ত কিছু বন্ধ নারীদের জন্য। তাই নারীর কাছে এখন অস্ত্র শুধুই জেদ। এই জেদই কবি কবিতা সিংহের কবিতার পথ দিল খুলে। আমাদের কাছে অজানা নয় সেইদিন যখন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন 'মেয়েরা আবার কবি কীসের', আমরা শুনেছি কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে, যিনি এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন 'মেয়েরা কোনো কালেই কবিতা লিখতে পারে না'। এমন অনেক বিখ্যাত লেখক কবি সাহিত্যিক রয়েছেন যারা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগ ও পরবর্তী সময় উভয় পর্যায়ে ভীষণভাবে বর্তমান। এরা নারীদের করুণা-সামগ্রী জ্ঞানে আজও মঞ্চে, আড্ডায়, কলোনিতে নির্ধারণ করে থাকে। আসলে শৈল্পিক আভিজাত্যের শিখরে উঠিয়ে রাখা প্রসাদ ও প্রাসাদের আরাম ভোগ করতে চায় একান্তভাবেই পিতৃতন্ত্রের পরিসর থেকে জাত পুরুষ। সেই প্রসাদ ও প্রাসাদ তীব্রভাবে সংরক্ষণ করতে গিয়ে নারীদের তারা যোগ্য মনে করতে অস্বীকার করে আজীবন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ জানে এই প্রসাদ একান্তভাবে পুরুষের। সর্বোপরি ক্ষমতা দিয়ে অধিগ্রহণ করবে তাই পুরুষ। নিজেদের মেধা দিয়ে মনন দিয়ে ব্যক্তিগত কল্পনাজাত প্রতিভা দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রসাদ প্রাপ্যের যোগ্যতা বহুকাল আগেই অর্জন করেছে নারীরা কিন্তু এই অর্জনের দার্ঢ্য মেনে নিতে রাজি নয় পিতৃতন্ত্র। তাই পুরুষেরা তাদের প্রাচীন প্রবৃত্তি দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়েও চেষ্টা চালিয়েছে কবি কবিতা সিংহের নাম মুছে ফেলার, এড়িয়ে যাওয়ার, ছন্দে ভুল ধরার, 'মহিলা কবি' সম্বোধন করে, নারীদের সৃষ্টিকার্যকে অনাবাশ্যক বাড়তি সম্মান দেখানো এবং পরিকল্পনা মতে সঠিক সময়ে হাত ছেড়ে দেওয়া। কোনো কবিপ্রতিভাকে মুছতে হলে তাকে কোনো নির্দিষ্ট

উদ্দেশ্য মতবাদের প্রতীকি করে রেখে দেওয়াটাও সমাজেরই বিশেষ চাল। তাই কবি কবিতা সিংহের নাম এলেই তার পাশে নারীবাদী কবি উচ্চারণ করা হয়। এই গণনাময় সভ্যতার চক্রান্ত বড় ভয়ংকর। নারীবাদ মানেই প্রতিবাদ, প্রতিবাদ বলতেই সমাজ বোঝে এবং বোঝায় স্লোগান ধর্মীতাকে। অতএব কবিতা যখন স্লোগান তখন সেটা আর কবিতা নয়। তবুও দুর্জনেরা শত চেষ্টা করেও কবিতা সিংহের কবিতাকে স্লোগানধর্মী কবিতা আখ্যা দিতে পারেনি। এর কারণ অবশ্যই কবিতা সিংহের আধুনিক সতেজ প্রজ্ঞাময় কল্পনা দীপ্তির আভাষ যা প্রতিটি কবিতায় বর্তমান। আসলে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতোই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্যায় নারীদের কাছে আরেক আলোড়নের কাল। এতদিনের কাব্যের ভাষা পাল্টে দেওয়া মেয়েরা অসম্ভব এক সাহসী হাওয়া নিজের বুকের ভিতর বয়ে এনেছিল। যেন নারী প্রথম জন্মালো নিজের ঐকান্তিক স্বরের আভা নিয়ে, যে আভা যুগের ধারাবাহিকতা থেকে পিছিয়ে নয় বরং খানিক এগিয়ে গিয়ে জানান দিচ্ছে এক অন্য আমি'র ঈশ্বরকে। এই নারীকে সংখ্যা করে রাখতে পারবে না সমাজ। এই নারীকে অস্বীকার করারও উপায় নেই তার যে একবার পড়ে ফেলবে তাদের কাব্যকে, ফলে সমাজ আবার নিল সেই পুরনো পন্থা। নিঃশব্দের রাজনীতি। যত উচ্চারণ কম, ততই সৃষ্টি যাবে মুছে, স্রষ্টাও যাবে মুছে। কিন্তু মুছতে না মুছতেই আগুন এবার জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে। পঞ্চাশ দশকের হাত ধরে হাজির হলেন কবি কবিতা সিংহ। বিশশতকের নারীযন্ত্রণার আত্মিক কণ্ঠস্বর শোনা যায় কবিতা সিংহের কবিতার ভিতর থেকে, যে মেয়েটি প্রজন্মের পর প্রজন্মের ওপর হয়ে আসা মিথ্যে দিয়ে সাজানো পুতুল খেলার সংসারের খড় মাটি বাঁশের উলঙ্গ অংশ দেখে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে সহস্রবছর ধরে ঘটে চলা পরিকল্পিত গণ্ডির ছলচাতুরী। তাই কবির কবিতায় নারী যেন ভিতর থেকে সর্বদা জাগ্রত এক চেতনাবোধ, এক সতর্কবাঘিনী। নিজের দীর্ঘদিনের কাঠামোতন্ত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলার মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেলেছে নারী। ক্রোধের আগুন জমিয়ে রেখেছে পিতৃতন্ত্রের মুখের ওপর ছড়িয়ে দেবে বলে। কবিতা সিংহ সেই একান্ত বিদ্রোহের স্বরের জন্ম দিয়েছে যা নারীকে হীনতার পথ থেকে সরিয়ে চরিত্রের পথে নিয়ে যেতে শুরু করেছে অর্থাৎ নারীর সমাজের প্রতি এই আত্মসমর্পণীবোধ থেকে ক্রমে সমাজের মুখোমুখি প্রশ্নকর্ত্রী এবং উপহাসসূচিকা রূপে গড়ে তোলার শব্দসৌকর্য্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে কবিতা সিংহের কবিতামালা। আত্মজিজ্ঞাসাবোধ থেকে জাত পরিশোধনপ্রক্রিয়াই হয়ে উঠলো কাব্যভাবনার

আধার। নিজেকে নির্মাণের দ্বারা পুনরায় ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেতনায় মগ্ন এক নারীজন্ম যেন পঞ্চাশের দশক থেকে উঠে আসতে শুরু করলো কবিতার ভিতরে। এই চেতনায় চক্ষুদান করলেন কবিতা সিংহ নিজে। যে চোখ থেকে ক্রমাগত খসে যায় যা কিছু দৃষ্টি নয়, যা কিছু অসার, কবি যেন তেমন এক চোখ তৈরি করলেন, যে চোখ প্রভূত খননকার্যের শেষে চরিত্রের হীরাটুকু বেছে আনতে সক্ষম। নারীকে বরাবর যৌবনের প্রতিরূপ করে আঁকা হয়েছে মূলস্রোতের সৃষ্টির ধারায়। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ নারীকে প্রকৃতিস্বরূপা হিসেবে চিহ্নিত করে বারে বারে উপহার দিয়েছেন প্রেমধর্মিতার সঙ্গে নারীজন্মের একাত্মতাকে। রবীন্দ্রনাথও নারীকে মাতা ও প্রেয়সীর বাইরে অন্য কিছু ভেবে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যসমাজ নারীকে 'মেয়েমানুষে' পরিণত করতে ব্যস্ত ছিল বলা যায়। অস্থিচর্মসার এই আবর্তনের বাইরে গিয়ে নারীর মনন মেধা ও মন নিয়ে কোনো চর্চা করতে রাজি ছিল না কাব্যসমাজ। তাই এইসকল অপমানের জ্বলন্ত স্পর্শে কবিতায় নিজেকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে শুরু করলো নারী স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে এসে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বয়ে চলা গোপন ও প্রত্যক্ষ আঘাতগুলি জবাব দিতেই যেন মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে তুললেন কবি কবিতা সিংহ তাঁর নিজস্ব চেতনার রমণীকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সূচনাপর্ব থেকেই নারী শিখে ফেললো বেঁচে থাকার স্বরূপভজনা। আত্মস্থতার প্রতি মগ্নতাবোধ। এই স্পৃহা নারীরা পেল নিজের জীবনযাপন বৃত্তের ভিতর থেকেই। যেভাবে কবি কবিতা সিংহ পেয়েছিলেন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের ভিতরেই যাপিত অক্ষরের রন্ধনশালাকে। স্বনির্ভরতার খিদে, জীবিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা, অর্থের অভাববোধ নারীকে শিখিয়েছে খেটে খেতে, খুঁটে খেতে, চিনে নিতে গোটা পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘ্রাণের ভিতর লুকানো বিষ-অমৃতবোধকে। তাই এই ক্ষত ও শুশ্রূষার ওষুধ স্বাধীনতা পরবর্তী স্রষ্টারা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কবিতার ভিতর। কবিতা তাই হয়ে উঠেছে সমর্পণী আচ্ছন্নতা পেরিয়ে বিদ্রোহের স্বরালাপ। কবি দেবারতি মিত্র সত্তরের দশকের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিরুচ্চারিত উচ্চারণের স্পর্ধা। জীবনকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে বাঁধতে না চেয়ে একান্ত ব্যক্তিগত স্বরে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর কবিতার ভিতরে। এত কম বলেও এত শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠা শব্দগোধূলি কিংবা শব্দসূর্য যেন

দেবারতির অন্তরের অন্দরমহলের চাবিকাঠির সন্ধান দিতে সক্ষম হয় সেইসকল পাঠককে যারা গভীরে যেতে ভয় পায় না। আদ্যোপান্ত অবশেষ নিয়ে বসে আছেন কবি দেবারতি মিত্র। তাঁর কাব্যিক দেখা যেন নিরাশার দেখা। সবটা জেনে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট ফলাফলের রচনায় মগ্ন তিনি। স্বাধীনতা পরবর্তী যে যুগ কবিদের কাব্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল সেই যুগের ভিতর পিতৃতন্ত্রের অন্য এক রাজনীতি গোপনে বাসা বেঁধেছিল। যে রাজনীতির আভাষ পেয়ে কবিতা সিংহ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নারীদের অন্তর্গত ছাইচাপা আগুনকে। যে আগুন জ্বলেছে তাঁর সমস্ত কাব্যজগত জুড়ে। সেই আগুনই যেন দেবারতি মিত্রের কবিতায় ঘর খুঁজেছে একান্তভাবে বিশ্রামের জন্য। যেন অশান্ত লেলিহান শিখাকে আশ্রয় দিয়েছেন কবি দেবারতি নিজের কাব্যের ভিতর। তিনি ধারণ করে আছেন নারীর যাপনবৃত্তির ইতিহাস-বর্তমান এবং আগত ভবিষ্যতকে। কবির ভিতর বাসা বেঁধেছে এক অপারগ যন্ত্রণাবোধ। যে যন্ত্রণা থেকে জাত নারী তার ভিতরের আগুনকে প্রশ্ন করেছে সমাজের আর কি কিছু বদলাবে কিনা জানতে চেয়ে। কারণ কবি দেখে ফেলেছেন পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতিকে যতভাবেই পাল্টানোর চেষ্টা করা হোক না কেন আবার নতুন কোনো ছলচাতুরীর দ্বারা নতুন কোনো গণ্ডি, ঠিক তৈরি করে ফেলবে পিতৃতন্ত্র নারীদের চারপাশে। যেন এমনই এক হতাশাবোধে, এমনই এক শেষের পরিণতি নিয়ে বসে আছেন কবি। কবি দেবারতি মিত্রের কবিতার ভিতরে শুনতে পাওয়া যাবে সেই বিদ্রোহী নারীর দীর্ঘশ্বাস।

দেবারতি মিত্র কবিতা সিংহকে নিয়ে করা এক আলোচনায় জানিয়েছিলেন যে এক পারে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সৃষ্ট কবিতা, যার ভিতর কামিনী রায় মানকুমারী বসু, প্রিয়ংবদা দেবীদের স্থান। অপর পারে যেন একা দাঁড়িয়ে আছেন কবিতা সিংহ। যেন দুই ইতিহাসের মাঝে বিরাট এক ফাটল রচনা করে কবিতা সিংহের অবস্থান। কিন্তু দেখা যায় আসলে কোনো দেওয়ালই নেই গবেষণায় নির্বাচিত কবি মানকুমারী বসু, কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে কবি কবিতা সিংহ এবং কবি দেবারতি মিত্রের। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যে কাব্যিক সত্তায় নিজেদের স্বরের জানান দিয়ে গেছেন মানকুমারী এবং কামিনী, তারই যেন ইতিহাসকে, সেই বপনসম্ভবা বীজকে ধারণ করে পঞ্চাশ দশকের কবি কবিতা সিংহ এবং সত্তর দশকের কবি

দেবারতি মিত্র তাঁদের কাব্যজীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন একটি পূর্ণ আবর্তনকে রেখা দেবেন বলে।

কবি মানকুমারী বসুর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির রহস্য আবৃত রূপকধর্মী সংকোচময় প্রকাশ যেন ভাষা পেল পরবর্তীকালীন কবি দেবারতি মিত্রের কাব্যচেতনার ভেতর। যেন এতদিন অধরা ছিল সেই সমস্ত শব্দগুলি, ইচ্ছেগুলি, কামনার প্রকাশগুলি যাকে গর্হিত জ্ঞানে নারীদের থেকে দূরে রেখে দিয়েছিল সমাজ। কবি দেবারতি মিত্রের কাব্যে ভীষণ জোরালো ক্রিয়াশীল নারীর আপন অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশের পথ খুঁজে পাওয়া গেল। এই উচ্চারণে আর কোনো আড়াল-আবডাল, ফুল-গাছ-নদীর বর্ণনার চাপা দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে রইলো না। ঝর্নার অঝোরবর্ষণ কিম্বা অর্জুন গাছের ছালে ছড়িয়ে থাকলো বিষয়ী হিসেবে চিহ্নিত নারীর কামনা-বাসনা-যন্ত্রণার কথা। এখান থেকেই দেবারতি মিত্রের মনন বিশ্লেষণ সম্ভব। চাপা, লজ্জাজনক সংকোচে মোড়া বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত নারীদের ভূমিকাগত পরিবর্তন ঘটলো দেবারতি মিত্রের কবিতার এক বিশেষ স্থান জুড়ে। নিয়ন্ত্রিত নারীও ক্রমশ হয়ে উঠলো নিয়ন্তা, যার ইন্ধনকর্ত্রীরূপে উপস্থিত ছিলেন কবিতা সিংহ। সেই নিয়ন্তা যে সচেতনভাবে নিজের ইতিহাস বহন করছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কবি কামিনী রায়ের কাব্যমজ্জা থেকে। ফলে ঘটেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নির্বাচিত কবিদের ভিতর ভাবনাগত বিন্যাসের মেলবন্ধন কোথাও না কোথাও। প্রত্যেকের উচ্চারণে, আবেগ প্রসারণে এবং প্রকাশে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। যেমন, কবিতা সিংহের জীবন যেন কবিতার প্রতিটি স্তবকের মধ্যে জীবন্ত। কোনো তত্ত্বের ওপর নির্ভর না করে জীবন যা দিয়েছে এবং যেভাবে দিয়েছে, বদলে যা যা কিছু কেড়ে নিয়েছে তার সবকিছুর দলিলকে পুড়িয়ে নির্ভেজাল করে উপস্থাপন করেছেন কবি কবিতা সিংহ তাঁর কবিতায়। কোনো শান্তির গল্প ও গন্ধ তাই খুঁজে পাওয়া যায় না কবিতা সিংহের কাব্যে। অপরদিকে কবি দেবারতি মিত্র যেন শান্তির জল নিজেই ছিটিয়ে চলেছেন নিজের মাথায়-দেহে-সর্বত্র। নারীদের জ্বলে ওঠায় বিশ্বাস তার আছে কিন্তু বিশ্বাস নেই এই সমাজের প্রতি। যে সমাজের বর্তমান আক্রমণের যুদ্ধের রীতিনীতি বড় ভয়ংকর এবং আরো কুচক্রীময়। হাতে মরীচিকা নিয়ে এই সমাজ, এই সম্ভ্রান্ত মূলস্রোত স্রষ্টাকে ডাক দেয় সম্মাননা জ্ঞাপনের অর্থে, আর তারপরেই চলে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের নিত্যনতুন প্র্যাকটিস পর্ব। বর্তমান সমাজের সুচারু রাজনীতির প্রভাবে নারীর প্রথমে

ঘটে বিহ্বল দশা আর তারপরেই আসে বিপন্নতাবোধ। সমাজের এই দীর্ঘকালীন কাব্যযাত্রার ভিতর দাঁড়িয়ে নারীদের একাকীত্বের উদ্‌যাপনেই মিলে যায় নির্বাচিত চারজন কবি, তারই বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এই গবেষণাপত্রটি। এই দীর্ঘ কর্মকাণ্ডকে সঠিক দিশা দিতে আমি সন্দর্ভপত্রটিকে বিভাজন করেছি চারটি অধ্যায়ে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ের নির্বাচিত কবি মানকুমারী বসু, কবি কামিনী রায় এবং স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাচিত কবি কবিতা সিংহ, কবি দেবারতি মিত্রকে নিয়ে নির্মিত এই কাব্যিক বিচার-বিশ্লেষণের অধ্যায়গুলি হল যথাক্রমে—

প্রথম অধ্যায় : **স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্যায়ের স্বর : সমাজে ও কাব্যজগতে**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **মানকুমারী বসু এবং কামিনী রায় : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালপর্যায়ের নির্বাচিত দুই কবির কাব্যে সমর্পণ ও বিদ্রোহের স্বর**

তৃতীয় অধ্যায় : **কবিতা সিংহ ও দেবারতি মিত্র : স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্যায়ের নির্বাচিত দুই কবির কাব্যে সমর্পণ ও বিদ্রোহের স্বর**

চতুর্থ অধ্যায় : **দুই কালপর্যায়ের নির্বাচিত কবিদের কাব্যে মিল-অমিল ও স্বরালাপের অভিমুখ**

সর্বশেষে উপসংহারের দ্বারা আমি সমগ্র সন্দর্ভপত্রে আয়োজিত আলোচনার নির্যাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।